**শ্রীচরেণেষু দাদা**

**পর্ব দুই**

শুভ্রের বড় দাদা অরুণ। শুভ্রের ভাবনায় নামটি বেশ শ্রদ্ধায় মিশে থাকে ।

শুভ্রদের পরিবারে পাঁচ ভাই আর তিন বোন। অরুণ দাদা সবার বড়ো। তারপর সুবীর, সঞ্জয়, আর বিকাশ। সবার ছোট শুভ্র। আর বড় বোন সুস্মিতা, যিনি স্বাধীনতার কয়েক বছর পর এক অজানা রোগে পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। মেঝ দিদি ইন্দ্রাণী, যিনি এখন সন্তান-সন্ততি আর নাতি-নাতনিদের নিয়ে সুখী জীবন কাটাচ্ছেন, তবু বয়সের ছাপ তার ক্লান্ত চোখে-মুখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বারবার অসুস্থতার সঙ্গে লড়াই করেও তিনি টিকে আছেন। কুমিল্লার গ্রামের বাড়ি আর পুরনো ঢাকায় ছেলে-মেয়েদের সংসারে দিনগুলো কেটে যাচ্ছে বেশ দিব্যি। মায়ের মতো পান চিবানোর অভ্যাসটা তিনি আর ছাড়তে পারেননি। তবে, যেখানে সেখানে পানের পিক ফেলানোর বাজে অভ্যাসটা অন্তত নেই। পাশে একটা গ্লাস নিয়ে বসে থাকেন। কেউ বয়স জিজ্ঞেস করলে মুখে একটি চন্দ্রাকৃতির হাসি দিয়ে বলেন, “আমার বয়স ত অনেক অইব।”

-“কত অইব, দিদি?” একদিন শুভ্র জিজ্ঞেস করে।

-“অইব, পঁচানব্বই-ছিয়ানব্বই অইব। বেশি ও অইতে পারে।”

দাদাবাবু তখন পাশে বসে পা নাড়াতে নাড়াতে মিষ্টি মিষ্টি হাসেন। শুভ্র জিজ্ঞেস করে, “আপনার বয়স কত, দাদা?”

-“বিরাশি।”

-“তাহলে দিদির বয়স এত বেশি কেন?”

-“তোমার দিদিরে জিজ্ঞাস করো।”

শুভ্র বুঝতে পারে যে বয়স নিয়ে দিদির ধারণা একেবারেই ভুল। তবে দিদি যে সুখে আছেন, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বয়সের হিসেবটা না থাকলেও কোন দোষ নেই।

শুভ্রের ছোড়দিদি মীনাক্ষী কুমিল্লায় বাস করেন, তার জীবন ছিল দুঃখ-কষ্টে ভরা। তবে এখন যেন শান্তির ছায়ায় আশ্রয় পেয়েছেন। বলা যায় একটি সুখী পরিবার।

শুভ্র বহু বছর ধরে বিদেশে আছে, তবুও বছরে অন্তত একবার নিজের দেশকে ছুঁয়ে দেখে। ঢাকায় তার ঠিকানা হলো বড় দাদা অরুণের বাড়ি। আজ শুভ্রের জীবনে যতটুকু সুখ, সবই দাদার ভালবাসার ফল।

দাদার এক পুত্র ও দুই কন্যা। সকলেই এখন সংসারী জীবনে প্রতিষ্ঠিত। পুত্র প্রতুল, বর্তমানে একজন খ্যাতিমান চিকিৎসক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। দুই কন্যা, পল্লবী ও রুপা, তাদের স্বামী-সন্তানসহ ঢাকায় বসবাস করছে। দাদার নাতি-নাতনিরাও এখন যথেষ্ট বড় হয়েছে। কেউ কেউ ইতিমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপন করে জীবনের নতুন পথে অগ্রসর হচ্ছে। পুরো পরিবারে শান্তি ও সমৃদ্ধির আলো ছড়িয়ে পড়ছে। একে অপরের প্রতি ভালোবাসা ও স্নেহে আবদ্ধ। এই পরিবারটি যেন সুখের এক মহীরুহে পরিণত হয়েছে।

রুপা দাদার ছোট মেয়ে।

রুপার মায়ের মৃত্যুর পর ওর সাথেই শুভ্রের দাদা অর্থাৎ রুপার বাবা অরুণ থাকেন।

রুপার সাথে প্রায়ই টেলিফোনে কথা হয় শুভ্রের। তখন দাদা এবং পরিবারের খোঁজ খবর নেয়। একদিন রুপা ছোট কাকাকে তার বাবার কথা বলতে গিয়ে কান্না থামাতে পারছিল না। ইদানীং রুপার বাবা অনেক কিছুই ভুলে যান, বয়সের ভারে আরও বেশি ন্যুজ হয়ে গেছেন। এই মানুষটিকে এখন না দেখলে বোঝা যাবে না যে এক সময় তিনি দুদণ্ড কথা না বলে থাকতে পারতেন না। সারাটা জীবন সংগ্রাম করেছেন, কিন্তু নিজের সুখের জন্য নয়। ভাই-বোনদের মানুষ করার জন্য তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। বাবার মৃত্যুর পর যখন পরিবারটা অসহায় হয়ে পড়ে, তখন কোনো উপায় না দেখে দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। আজ সেই মানুষটি কেমন যেন হারিয়ে যাচ্ছেন, স্মৃতির ধোঁয়াশায়।

কয়েক দিন আগে সকালের নাস্তা নিয়ে কি কাণ্ডটাই না ঘটে গেল। সেটাই টেলিফোনে কাকাকে বলছিল রুপা।

দিনটা ছিল শুক্রবার।

সকালবেলা আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই বাসার সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। রুপার বাবা প্রতিদিনের মতো খুব ভোরে উঠলেন। কারো যাতে কোনো অসুবিধা না হয়, সে জন্য তিনি ঘন্টাখানেক নিজের ঘরেই বিভিন্ন ধরনের ব্যায়াম করলেন। এরপর হাত-মুখ ধুয়ে ঠিক ছয়টার সময় টিভিটা চালিয়ে বসে গেলেন প্রতিদিনকার মতো রাম-দেবের যোগ ব্যায়ামে যোগ দিতে।

ঠিক সাড়ে সাতটায় রুপা বাবাকে সকালের খাবার দিবে। প্রতিদিন তাই করে। রুপাদের বাসায় একজন কাজের দিদি আছেন, যিনি অনেক বছর ধরে এই বাড়ির অঙ্গ হয়ে উঠেছেন। এমনকি, উনাকে পরিবারের একজন বললেও ভুল হবে না। পুরনো ঢাকায় ছেলের সংসার রয়েছে, তাই মাসে অন্তত একবার সেখানে যান। এক-দুই দিন সেখানে থেকে আবার ফিরে আসেন। এই বাড়িটা যেন তার সবকিছু—ঘর-গেরস্থালী, আনন্দ-বেদনা, আশা-ভরসার, বর্তমান-ভবিষ্যতের এক নিখুঁত আশ্রয়স্থল। আজ দিদি ছিলেন না। ছেলের বাড়ীতে গেছেন।

রূপা রান্নাঘরে চা বানাচ্ছিল। প্রতিদিনের মতো সকালে বাবার জন্য এক কাপ গরম চা, দুটো রুটি, এক বাটি সবজী আর একটা ডিমের ওমলেট নিয়ে এলো। রুপার বাবা তখন খাবার টেবিলেই বসা ছিল খাবারের প্রতীক্ষায়।

“বাবা, তোমার নাশতা,” রূপা ধীরে ধীরে বাবার সামনে প্লেটটা রেখে দেয়।

অরুণ মাথা নাড়িয়ে প্লেটের দিকে তাকালেন। চুপচাপ খেতে লাগলেন, কিছুই বললেন না। তার মন যেন অন্য কোথাও চলে গেছে। খাওয়া শেষে তিনি চুপচাপ নিজের রুমে গিয়ে বসলেন, কোনো কথা বললেন না। রূপা তার নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

এক ঘন্টা পর, রুপার বাবা ডাকলেন, “রূপা, আমার নাশতা এনে দে।”

রূপা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তার মনে হলো হয়তো বাবা মজা করছেন। “বাবা, তুমি তো একটু আগেই নাশতা করেছো!”

মেয়ের কথা শুনে অরুণের মুখে এক ধরনের বিরক্তি ফুটে উঠল। “তুই কি মজা করছিস? আমি নাশতা করিনি। তাড়াতাড়ি এনে দে।”

“না, বাবা। এক ঘন্টা আগেইতো তুমি সবজী আর ডিম দিয়ে দুটি রুটি খেলে।“-রুপা বাবাকে খুব অবাক দৃষ্টিতে বললো।

অরুণ চোখ বড় বড় করে রূপার দিকে তাকালো। "কি বলছিস তুই? আমি কিছুই খাইনি। তুই ভুল করছিস। দেরী করিস না, তাড়াতাড়ি আন।"

রূপা বাবার মুখের দিকে চেয়ে রইল। বাবার কণ্ঠে ক্রোধ আর হতাশার মিশ্রণ স্পষ্ট। "বাবা, আমি নিজে তোমার জন্য খাবার এনেছি। তুমি নিজেই খেয়েছ। তুমি কি সত্যিই মনে করতে পারছ না?" তার কণ্ঠে চিন্তার ছাপ ফুটে উঠল।

অরুণ কেমন যেন ঘাবড়ে গেলেন। "তুই কি বলছিস, রূপা? আমি তো ঠিক মনে করতে পারছি না। কেন এভাবে বলছিস?" তার গলার স্বরটা হঠাৎ করেই নরম হয়ে গেল, কিন্তু তাতে একটা গভীর অসহায়ত্ব ফুটে উঠল।

রূপা একটু কাছে গিয়ে বাবার হাত ধরল। "বাবা, তুমি কি ঠিক আছো? তোমার কি কিছু মনে পড়ছে না?"

অরুণ ধীরে ধীরে হাতটা সরিয়ে নিলেন। তার চোখে অদ্ভুত এক শূন্য দৃষ্টি। "আমি ঠিক নেই, রূপা। আমার কিছুই ঠিক নেই। তোরা আমাকে উপোষ রেখে মারতে চাস। এইটা ঠিক না।“

রূপা হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বাবার এই পরিবর্তন দেখে তার মন খারাপ হয়ে গেল। তার চোখে জল ভেসে উঠলো। বাবার মুখে বিরক্তি দেখে সে বুঝতে পারল, এই বিষয়ে কথা বাড়ালে সমস্যা হতে পারে। সে বাবার কেমন যেন বদলানো আচরণ দেখে চিন্তিত হয়ে পড়ল। “ঠিক আছে, বাবা। আমি নিয়ে আসছি।”

কিছুক্ষণ পর, রূপা আবার এক প্লেট নাশতা নিয়ে এলো। কিন্তু এইবার রুপার বাবা প্লেটটা হাতে নিয়েই বললেন, “তুই কেন আমাকে এইসব দিচ্ছিস আবার? আমি তো খেয়েছি।” তার কণ্ঠে রাগ আর হতাশা।

রূপা কিছু বলতে পারল না। বাবার অস্থিরতা আর বিরক্তি দেখে তার মনে হলো কিছু একটা ঠিকঠাক নেই। “বাবা, আমি ভুল করেছি, তুমি রাগ করো না।”

কিন্তু অরুণ কিছু না বলে চুপচাপ বসে রইলেন। তার মুখ থেকে কোনো কথা বের হলো না, শুধু চোখে অদ্ভুত এক চাহনি। রূপা বুঝতে পারল, বাবা আজ সারাদিন এভাবেই থাকবেন। সে নিজের কষ্ট চেপে রেখে রান্নাঘরে ফিরে গেল।

সারাদিন অরুণ চুপচাপ ঘরে বসে থাকলেন। মাঝে মাঝে বারান্দায় এসে রেলিঙে হাত ধরে বাইরে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর চোখে এক ধরনের শূন্যতা ছিল।

রূপা বাবার এই চেহারা দেখে কাঁদতে লাগল। সে জানতো তার বাবা স্মৃতিভ্রংশে ভুগছেন, কিন্তু আজকের ঘটনা তাকে গভীরভাবে আহত করলো। বিকেলের দিকে সে বাবার কাছে এসে দাঁড়ালো। চাদরটা দুহাত দিয়ে গায়ে জড়িয়ে দিতে দিতে বলল, “বাবা, আমি সরি। আমি বুঝতে পারিনি তুমি কি চাও। আমাকে ক্ষমা করে দিও। আর রাগ করো না বাবা।”

রুপার বাবা কোনো সাড়া দিল না। শুধু রূপার দিকে ঘুরে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। রূপা বুঝতে পারল, বাবা হয়তো ভুলে গেছেন তাদের সকালে কি হয়েছে। তার মন অন্য কোনো স্মৃতিতে হয়তো হারিয়ে গেছে।

হঠাৎ রূপা বাবার দিকে তাকিয়ে দেখল, তার চোখের কোণায় জল। সে জানে না তার বাবা ঠিক কি ভাবছে তখন, কিন্তু তার মনে হলো, এই মুহূর্তে তার বাবাকে কিছুতেই বিরক্ত করা উচিত হবে না। সে চুপচাপ বাবার খুব কাছে এসে দাঁড়াল। হাত দিয়ে বাবার কাঁধে আলতো করে ছুঁয়ে দিল। মাথায় হাত বুলিয়ে দিলো। পাশ থেকে একটা চেয়ার এনে বাবাকে সেখানে বসতে বললো।

শুভ্রের কাছে যখন রুপা টেলিফোনে এসব বলছিল তখন শুভ্রের বুঝতে অসুবিধা হলো না যে রুপার কণ্ঠ ভিজে আসছে। একটা যন্ত্রণার কাটা গলাটাকে চিবিয়ে ধরছে। শুভ্র, দাদার অতীতকে ভালো করেই জানে। জীবনের বহু স্মৃতির রঙিন গল্প শুভ্র শুনেছে তার দাদার কাছ থেকে। শুভ্রই নিজের দাদাকে অতীত জীবন সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করতো। এইতো গত বছর যখন দেশে যায় তখনও শুভ্র দাদার কাছে বসে শোনে মুক্তিযুদ্ধের ভয়াল দিনগুলোর কথা, যখন তাদের পরিবারটি ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। সেই-সঙ্গে, ঢাকায় প্রথম পা রাখার পর থেকে ব্যবসা শুরু করার আগ পর্যন্ত দাদার জীবনে ঘটে যাওয়া বিস্ময়কর ঘটনাগুলোও সেদিন দাদার মুখে শোনে শুভ্র।

আজ তার মনের পর্দায় ধীরে ধীরে দাদার অতীতের স্মৃতি ভেসে উঠছে। যেদিন প্রথম ঢাকায় পা রাখে শুভ্রের দাদা সে রাত্রির কথা মনে হলে এখনো চোখের পাতাগুলো ভিজে যায়। বুকের মধ্যে কেমন একটা চিন চিন ব্যথা অনুভব করে।

আজ তার চোখের সামনে ভেসে উঠল দাদার সেই পুরনো রাতের কথা। যেদিন দাদা প্রথমবার ঢাকায় আসেন। দাদার কাছেই শুনেছেন, ঢাকার সেই প্রথম রাতটি ছিল নির্ঘুম। তার পাশে বসা অন্যদের নিঃশ্বাসের শব্দ, বাইরে রাস্তার কুকুরের ডাক, আর ভবনের ছাদে বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ—সবকিছুই তার মনের মধ্যে ভয়ের ডঙ্কা বাজাচ্ছিল। তিনি জানতেন না কীভাবে তার এই যাত্রা শুরু হবে, কীভাবে তিনি নিজের জন্য এই শহরে একটা জায়গা তৈরি করবেন।

আজ বহুদিন পর লন্ডনের নিজ বাড়ীতে বসে শুভ্র তার দাদাকে নিয়ে ভাবছে।

সেই পুরনো স্মৃতির দরজায় কড়া নাড়ছে। শুভ্রের দাদার মনের গহিনে আজ হয়তো তার স্মৃতি নেই। সবকিছুই এক ধরনের কুয়াশায় ঢাকা পড়ে গেছে।

শুভ্রের মনে হলো “দাদার জীবনের প্রথম রাতে যেমন তিনি অজানা ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, ঠিক আজও তেমনি তাকিয়ে আছেন কোন এক অজানা ভবিতব্যের দিকে। কিন্তু আজ আর সেই ভয় নেই, শুধু আছে একটা মৃদু স্মৃতি, যা ধীরে ধীরে তার মনের গভীরে হারিয়ে যাচ্ছে।“

সেই ভয়ানক লোকটির শব্দ তখনো অরুণের কানে বাজছে “তোর টাকাটা দে।”

সেই রাত্রের অন্ধকার শহরের প্রথম স্পর্শটা ছিল ভয়াবহ, নির্মম। লোকটির পা ধীর গতিতে রাস্তার ধারে হারিয়ে যেতে যেতে অরুণের কানে ভেসে এলো সেই পুরনো কণ্ঠস্বর—“এগিয়ে যা, অরুণ! পেছনে তাকাস না!”

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকার পর, অরুণ আবার ধীরে ধীরে চলতে শুরু করল। তার পা ভারী, শরীর ক্লান্ত। কোনো এক অজানা শক্তি যেন তাকে জোর করে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সে জানে না কোথায় যাচ্ছে, কিন্তু জানে, থামার কোনো উপায় নেই।

চারপাশে তখন সন্ধ্যার নিস্তব্ধতা। রাস্তায় খুব একটা মানুষ নেই, যারা আছে তাদের মুখে অন্ধকারের ছাপ। স্টেশনের পাশে কিছু দোকানের আলো টিমটিম করে জ্বলছে। অরুণ সেই আলোগুলোর দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল, তার এই যাত্রা কতটা কঠিন হতে চলেছে।

একটা চায়ের দোকানে গিয়ে সে থামল। তার মুখ থেকে কোনো কথা বের হলো না। কিন্তু দোকানের মালিক তার দিকে তাকিয়ে তার ক্লান্ত মুখ দেখে বুঝতে পারল, এই ছেলেটি এক কাপ চায়ের জন্য এসেছে। মালিক তাকে এক কাপ গরম চা এনে দিল, বললো-“তোমাকে কোন পয়সা দিতে হবে না।“

অবাক হয়ে অরুণ কাপটা হাতে নিয়ে ভাবতে লাগল, এই চায়ের কাপটাই হয়তো তার জীবনের শেষ শান্তির মুহূর্ত। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সে যেন নিজের ভেতরের সব ক্লান্তি ভুলে যেতে চাইল।

-একটা বনরুটি?-এ বলে পকেটে হাত ঢুকালো।

-“থাক, থাক, পয়সা লাগবে না”-এই বলে একটা প্যাকেট থেকে একটা রুটি বেড় করে এগিয়ে দিলো।

চা-রুটি শেষ করে সে ধীরে ধীরে আবার হাঁটতে শুরু করল। স্টেশনের পাশের রাস্তাটি তখন প্রায় ফাঁকা। কিছু রিকশা স্টেশনের সামনে অপেক্ষা করছে। অরুণ কোনো দিকে না তাকিয়ে সামনের রাস্তায় পা দিলো। ভেজা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে ভাবতে লাগল, এই শহর তাকে কোথায় নিয়ে যাবে? তার সামনে কি কোনো আশ্রয় আছে, নাকি এই শহরের অন্ধকারে সে চিরতরে হারিয়ে যাবে? তার সমস্ত আশা, সমস্ত স্বপ্ন এই শহরের কোনো এক কোণে লুকিয়ে আছে কিনা, সে জানে না। কিন্তু তার মন তাকে শুধু একটাই নির্দেশ দিচ্ছে—“এগিয়ে যা, পেছনে তাকাস না। এই শহরেই তোর ভবিষ্যৎ লুকিয়ে আছে।”

একটু এগিয়ে আসতেই, তার সামনে হঠাৎ করে একজন বয়স্ক লোক হাজির হলো। তার চেহারায় ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট, কিন্তু তার চোখে-মুখে এক ধরনের সহানুভূতি ছিল। অরুণ তাকে দেখে একটু থেমে গেল। লোকটি তার দিকে তাকিয়ে বলল, “বাবা, কোথায় যাইতাছ? দেখতাছি খুব ক্লান্ত লাগতাছে।”

অরুণ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। সে বুঝতে পারছিল না, এই লোকটি কি তার উপকার করতে চাইছে, নাকি আরও কোনো বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু লোকটির মুখের আন্তরিকতা দেখে সে একটু সাহস পেল। “জানি না, চাচা। কোথায় যাইব, কিতা করব, কিছুই জানি না।”

লোকটি একটু হাসল, তার মুখে মৃদু এক করুণার ছাপ পড়ল। “এই শহর বড় নিষ্ঠুর বাবা। এখানে কেউ কাউকে চেনে না, কেউ কারও উপকার করতে আসে না। কিন্তু তুই কই যাইবি এই রাতে। তুই কি এই শহরে নতুন আইসছ?”

অরুণের চোখে জল এসে গেলো। তার এতক্ষণ ধরে জমে থাকা হতাশা এক নিমিষে ফেটে পড়ল। সে লোকটির সামনে গিয়ে বলল, “চাচা, আমার কাছে আর কিছু নেই। গ্রাম থেকে পালিয়ে এসেছি। আমার পরিবার, আমার সবকিছু পেছনে ফেলে শহরে আইছি। এখানে আমি একা। কিছুই জানিন কি করবো, কই থাকবো, জানা শুনা কেউ নাই।”

লোকটি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তার চোখে-মুখে চিন্তার ছাপ পড়ল। সে ধীরে ধীরে বলল, “শহরে নতুন কইরা জীবন শুরু করা খুব কঠিন, বাবা। এখানে টাকার অভাব, খাওয়ার অভাব, কাজের অভাব—সবকিছুই আছে। কিন্তু সাহস থাইকলে কিছু না কিছু করতে পারবি।”

অরুণের চোখে একটু আশার আলো ফুটে উঠল। সে লোকটির দিকে তাকিয়ে বলল, “আমি কাজ করব, চাচা। কিছু একটা করব, যে কোনো কাজ করতে রাজি আছি।”

লোকটি মৃদু হাসল। “এখানে কাজ খুঁইজ্যা পাওয়াটা এতো সহজ না। কিন্তু তুই মনে হয় পারবি। তোর চোখে আগুন জ্বলতাছে। আয়, আমার লগে আয়।”

অরুণ লোকটির কথায় কিছুটা স্বস্তি পেল। তার মনে হলো, এই লোকটি তাকে কিছুটা হলেও সাহায্য করতে পারবে। সে লোকটির পেছনে পেছনে হাঁটতে লাগল।

লোকটি তাকে শহরের আরও ভেতরের দিকে নিয়ে যেতে লাগল। রাস্তার ধারে কিছু পুরনো বাড়ি, ছোট ছোট দোকানপাট—সবকিছুই যেন অরুণের জন্য নতুন এক অভিজ্ঞতা। লোকটির সাথে হেঁটে চলতে চলতে, অরুণ সামনে একটি পুরনো, পরিত্যক্ত ভবন দেখতে পেল। ভবনটি খুবই জরাজীর্ণ, দেয়ালগুলো ধসে পড়ার পথে। লোকটি সেখানে গিয়ে থামল।

“এই বাড়িডাতে কেউ নাই, বাড়ীডা খালি,” লোকটি বলল। “কিছু লোক এখানে আশ্রয় নেয়, যারা গ্রাম থেকে আইসা এই শহরে নতুন কিছু খুঁইজ্যা বেড়ায়। তুইও এখানে থাকতে পারিস। তবে সাবধান থাকিস, এই শহরডা খুব বিপজ্জনক।”

অরুণ ভবনটির দিকে তাকিয়ে একটু দ্বিধায় পড়ে গেল। ভবনটি তার জন্য নিরাপদ হবে কিনা, সে বুঝতে পারছে না। কিন্তু তার সামনে আর কোনো বিকল্প নেই। সে লোকটির দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল, “ধন্যবাদ চাচা। আপনি না থাকলে আমি জানি না কোথায় যেতাম।”

লোকটি একটু হেসে বলল, “শহরে কেউ কাউরে সাহায্য করে না। তবে অহনো কিছু মানুষ আছে যারা নতুন মানুষরে একটু সাহায্য করতে চায়। তবে মনে রাহিস, নিজের কাম নিজেকেই করতে হইব। আশা করি, তুই এখানে নতুন জীবন শুরু করতে পারবি। ভালো থাকিস, বাবা।”

এই কথা বলে লোকটি অরুণকে বিদায় জানিয়ে চলে গেল। অরুণ সেখানে একা দাঁড়িয়ে রইল, তার সামনে সেই পুরনো ভবন, আর চোখের সামনে নতুন এক জীবনের সম্ভাবনা। ভবনটির ভেতরে পা রাখতেই, সে বুঝতে পারল কতটা কঠিন হবে এই যাত্রা।

ভেতরে কিছু মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে, কেউ কেউ ঘুমাচ্ছে। তাদের চেহারা থেকে স্পষ্ট যে তারাও অরুণের মতো একই পরিস্থিতিতে আছে। অরুণ তাদের দিকে একবার তাকিয়ে নিজের জন্য একটা কোনা খুঁজে বের করল। ভাঙা দেয়ালের পাশে সে বসে পড়ল, পিঠ ঠেকিয়ে। পাশ দিয়ে দুটি ইঁদুর সন্তর্পণে চলে গেল।

তার চোখে-মুখে ক্লান্তি স্পষ্ট, কিন্তু তার মন শক্ত। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, সে হেরে যাবে না। এই শহরে, এই অন্ধকারের মধ্যেও সে নিজের জায়গা তৈরি করবে।

তার মাথা ধীরে ধীরে ঘুমের ভারে নুয়ে পড়ছে। সারাদিনের অবসাদের পর ঘুমের জালে সে ধরা পড়েছে। সে জানে না আগামীকাল তার জন্য কি অপেক্ষা করছে, কিন্তু একটাই কথা তার মনে গেঁথে আছে—সে কখনও হার মানবে না।

**চলবে--- পর্ব ২)**

**ড. পল্টু দত্ত**

শিক্ষক, গবেষক এবং কলামিষ্ট